গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ : অক্সফোর্ড গাড়ি ও বেয়াড়া এক ঘোড়ার কাহিনী
শিশির ভট্টাচার্য্য

১. প্রাণরক্ষার চিরন্তন আকুতি
জড় আর প্রাণের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। এ দ্বন্দ্বে প্রাণের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে প্রাণীদেহকে জড়ের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। এর ফলে প্রাণীশরীর ক্রমাগত বিবর্তিত হতে থাকে। ডারউইনীয় বিবর্তনের নিয়মে সৃষ্টি হয় কানকো, হাত, পা, মস্তিস্ক। মস্তিস্ক বিবর্তিত হতে হতে এক সময় লাভ করে প্রাণের চরম রূপ : মানব মন। মন থেকে ভাষা। সজারুর কাঁটা বা জিরাফের লম্বা গলার মতো ভাষাও প্রাণরক্ষার একটি অস্ত্র। ভাষার মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগ। যোগাযোগ থেকে গোষ্ঠী, সমাজ। প্রাণরক্ষার আকুতি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অবচেতনে জাগরুক থাকে। সমাজের প্রতিটি সদস্য প্রাণরক্ষার এ দায়িত্ব ভাগ করে নেয়। অন্য সব কিছুর মতো প্রাণকেও দু'ভাবে দেখা যায় : ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক। একদিক থেকে দেখলে মানুষ মরণশীল আবার অন্যদিক থেকে দেখলে মানুষ অমর, কারণ বংশানুক্রমে মানুষ বেঁচে থাকে।

প্রাণ কি? জিগ্যেস করেছিলাম এক ফরাসী জীববিজ্ঞানীকে। তিনি বলেছিলেন : এক কথায় যদি উত্তর চান, প্রাণ হচ্ছে 'গ্রহণ' : শ্বাস নেওয়া, পান করা এবং খাওয়া। এই তিন কাজ যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ জীবকোষ বিভাজিত হয়ে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। গ্রহণ যেই শেষ হলো বর্ধনেরও সেখানেই সমাপ্তি। ইদানিং কালে পরিবেশদূষণের কারণে শ্বাস নেওয়া কঠিন হয়ে উঠছে বটে কিন্তু এ সমস্যা এখনও ততটা প্রকট নয়। প্রাণরক্ষার যে চিরকালীন সমস্যা মানুষের সেটি হচ্ছে প্রধানত খাবারের এবং কোন কোন অঞ্চলে সুপেয় জলের।

রিজিকের মালিক আল্লাহ। কিন্তু সুপ্ত সিংহের মুখে মৃগ এসে প্রবেশ করে না। মানুষকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাবার জোগাড় করতে হয় প্রাণরক্ষার প্রয়োজনে। খাবার কখনই অফুরন্ত ছিল না পৃথিবীতে। কেক সব সময়ই ছোট ছিল এবং নাদান খানেওয়ালা বেশী ছিল। ব্যক্তি তার প্রাণরক্ষার জন্যে কেকের ভাগ নিশ্চিত করতে চায়। এ কাজ সহজতর করার জন্যে সে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়। আপনি যদি কেক খেয়ে ফেলেন তবে আমি বাঁচি কি করে? আমার গোষ্ঠী যদি কেকের পুরোটা সেঁটে দেয় তবে আপনার গোষ্ঠীর প্রাণই বা কিভাবে রক্ষা পায়? এ সমস্যার একটি সহজ সমাধান হতে পারে এ রকম : আমি বা আমার গোষ্ঠীর সব সদস্য মিলে আপনি বা আপনার গোষ্ঠীর অন্য সব সদস্যকে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দিলাম। কেক খাওয়ার লোক কমে গেল। আমাদের ভাগ গেল বেড়ে। কিন্তু আপনিই বা সহজে ছাড়বেন কেন? অতএব যুদ্ধ। দেখিব খেলাতে কে হারে কে জেতে কেনা হলে শেষ!

২. শ্রেণী ও তার স্বার্থ
গোষ্ঠী কখনও সুষম হয় না। আমি চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছি : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শুদ্র ও বৈশ্য। যার তার কথা নয়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী। শ্রীকৃষ্ণই করুন বা অন্য যেই করুন, সমাজে শ্রেণী সৃষ্টি হয়ে চলে। জন্মগতভাবে প্রতিটি মানুষ আলাদা। বয়স বাড়তে বাড়তে মানুষ তার নিজের প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে সমপ্রকৃতির অন্য কিছু মানুষের সাথে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়। গোষ্ঠীর অন্য সদস্যদের

আমি ভালোবাসি, ভালো না বাসলেও সহ্য করি, কারণ তারা আমার প্রাণরক্ষার সহায়ক। অন্য গোষ্ঠীর মানুষকে আমি ঘৃণা করি, কারণ তারা আমার প্রাণের জন্যে ঝুঁকি। ঘৃণা ভালোবাসার তুলনায় আদিমতর একটি অনুভূতি। প্রাণরক্ষার আদিম দুশ্চিন্তা এক গোষ্ঠীকে অন্য গোষ্ঠীর মুখোমুখি দাঁড় করায়। বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যাগ্র মেদিনী! কালক্রমে মানুষ বুঝতে পারলো অন্য গোষ্ঠীর সদস্যদের মেরে ফেলতেই হবে এমন কোন কথা নেই। বিপদজনক না হলে কেকের সামান্য ভাগ তাদের দেয়া যেতে পারে এবং এক সময় গোষ্ঠীর স্বার্থে তাদের কাজেও লাগানো যেতে পারে।

শক্তিশালী ব্যক্তিটি দূর্বল অন্য একটি ব্যক্তিকে খাটায়। সবল একটি শ্রেণী খাটিয়ে নেয় দূর্বলতর একটি শ্রেণীকে। কতক্ষণ খাটতে পারে একটা মানুষ? বারো থেকে পনেরো ঘন্টা, ঘুমের সময় বাদে দিনের বাকী পুরো সময়টা। কতটুকু খাবার তাকে দিতে হবে? যতটুকু না হলে তার প্রাণধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। তার কি বিয়ে-সাদীর দরকার আছে? নিশ্চয়ই আছে। বিবাহ করা ফরজ। এতে নুতন দাস দাসীর জন্ম হবে। তার কি অবসরের প্রয়োজন আছে? খুব বেশী নয়। অলস মস্তিস্ক শয়তানের কারখানা। অনেক অনেক যুগ পরে সপ্তাহে একদিন তাকে কাজ বন্ধ রাখার অনুমতি দেওয়া হলো। বিশ্রামবারে ধর্মস্থানে গিয়ে সে দুই দুনিয়ার মালিকের কাছে প্রার্থনা জানাবে যাতে সে সুস্থ সবল থাকে এবং আরও অনেকদিন উদয়াস্ত খাটতে পারে এই দুনিয়ার মালিকের জন্য।

৩. পুঁজিবাদ ও বিশ্বায়ন

দুই একটি আঁচড়ে সমাজদর্শনের এই যে ছবিটি আঁকলাম উপরে, তার নাম পুঁজিবাদ। পুঁজিই এই দর্শনের মূল কথা। উৎপাদনের চারটি উপাদান : ভূমি, শ্রম, পুঁজি আর সংগঠন উৎপাদন শেষ হলে পরে নিজ নিজ প্রাপ্য বুঝে নেবে। উপাদানগুলোর মূল্য নির্ধারিত হবে চাহিদা ও সরবরাহের মাধ্যমে। যদি চাহিদার তুলনায় জমি বা শ্রমের সরবরাহ বেড়ে যায় তবে এর দাম কমবে। লক্ষ্য করুন, এই চারটি উপাদানের মধ্যে তিনটিই মালিক পক্ষের হাতে : জমি, পুঁজি আর সংগঠন। তিনটি উপাদানের পাওনা এক জায়গায় জমতে জমতে পুঁজির পরিমাণ বেড়ে চলে এবং সাথে সাথে বেড়ে চলে তার ক্ষমতা। পুঁজির গুরুত্ব বেশী এ কারণে যে পুঁজি ছাড়া উৎপাদনের অন্য তিনটি উপাদানের একটিও সংগ্রহ করা যায় না। কিন্তু শ্রম, ভূমি বা সংগঠনের বিনিময়ে পুঁজি জোগাড় করা অসম্ভব। টাকার কোন দাম নেই কিন্তু যে কোন দামী জিনিষ কিনতে টাকার দরকার।

শ্রমিকের সরবরাহ সর্বকালেই বেশী। তাই চাহিদা ও সরবরাহের অমোঘ নিয়মে শ্রমের মূল্য কখনই বেশী থাকে না। পুঁজির উপর শ্রমের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকার কথা নয়। অন্যদিকে উৎপাদনের প্রতিটি উপাদানের উপর পুঁজির সর্বময় নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। পূজি তার নিজের স্বার্থে কোন উপাদানেরই উচিত মূল্য দিতে চায় না। কেন দিতে চাইবে? তাকেতো নিজের প্রাণ রক্ষা করতে হবে! অর্থনীতিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনবিধি নামে অন্য একটি নিয়ম রয়েছে। এই নিয়ম কার্যকরী হওয়ার কারণে একটি বিশেষ সীমার পর নির্দিষ্ট স্থানে উৎপাদন আর বাড়ে না, অর্থাৎ পুঁজির খাই অনুসারে বাড়ে না। উৎপাদন না বাড়লে পুঁজিও সীমিত হয়ে পড়ে। পুঁজি মনে মনে শঙ্কিত হয়। হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন খানে। বিশ্বের নিত্য নূতন সব অঞ্চলকে পুঁজি তার আওতায় নিয়ে আসতে চায়। ড্রাকুলার বাঁচার জন্যে নূতন রক্ত দরকার। পুঁজিবাদের সর্বশেষ সংস্করণ এই ‘বিশ্বায়ন’। এই তত্ত্ব অনুসারে পুঁজির হবে বিশ্বময় অবাধ গতি। বিশ্বের যে কোন জমিতে চলবে উৎপাদন। কিন্তু

উৎপাদনের অন্যতম একটি উপাদান যে শ্রমিক তাকে কোথাও যেতে দেওয়া হবে না। ভিসা বন্ধ। কোথাও যাওয়ার দরকার নেই লুসি, ড্রাকুলাই আসবে তোমার কাছে। শ্রমিকেরা তাদের নিজ নিজ দেশের এক্সপোর্ট প্রমোশন জোন বা ই.পি.জেডে সেজেগুজে অপেক্ষা করে থাকবে। 'ও মনের রাজা, একবার তুমি দেখা দাও আমায়!' কোন একদিন পুঁজি তার সময়মত এসে তাদের 'কামবাসনা' (অর্থাৎ কর্মের বাসনা!) পূরণ করবে। পুঁজিবাদের হাতে শ্রমিকের বেশ্যায়ন সম্পূর্ণ হবে।

৪.সাম্যবাদ ও বিপ্লব

পুঁজিবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি কাম্য অবস্থা। কেউ কখনও এর মধ্যে বিন্দুমাত্র অসঙ্গতি খুঁজে পাননি। গত সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে জ্ঞানের অগ্রগতির ফলে কিছু কিছু দার্শনিক ভাবলেন : এ কেমন অন্যায় কথা! মানুষতো একটি মাত্র প্রজাতি। তার মধ্যে যা কিছু পার্থক্য - গাত্রবর্ণ, উচতা বা মুখমণ্ডলের, সেগুলোতো তার ভৌগলিক অবস্থানের কারণে। মানুষে মানুষে শক্তি, বুদ্ধি আর ধনের যে পার্থক্য তাও একান্ত আপেক্ষিক। তাহলে কেন একটি শ্রেণী অন্য একটি শ্রেণীকে দাস করে খাটিয়ে নিজের ফায়দা লুঠবে? এতো মনুষ্যত্বেরই অপমান। তুমি যারে নিজে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে। সবার উপরে মানুষ সত্য। শোনা গেল নুতন নুতন সব কথা। 'মানবতাবাদ'। 'মৌলিক অধিকার' : অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি। কার্ল মার্ক্স তাত্ত্বিকভাবে দেখালেন, কেমন করে পুঁজিবাদের চরম উন্নতির পর সৃষ্টি হবে শ্রেণীহীণ সমাজ। মার্ক্সের তত্ত্ব অনুসারে সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম আসতে পারত সে সময়ে ইওরোপের তিনটি দেশে : ইংল্যাণ্ড, জার্মানী ও ফ্রান্স আর খুব বেশী হলে, আটলান্টিকের এপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

শোষিত মানুষের কানে গেল এক সময় তাদের অধিকারহীনতার কথা। তারা শোনামাত্র সচেতন হলো। মৌলিক অধিকার কে না চায়? কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। অন্যকে নামমাত্র মজুরীতে খাটিয়ে ফায়দা লুঠবার মজা আজন্ম পেয়ে আসছে যে মালিক সে সহজে তার এই জন্মগত সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে চাইবে কেন? মৌলিক অধিকার আদায়ে মালিকপক্ষ বাধা দেবেই। মালিকেরা সশস্ত্র, সংঘবদ্ধ। শ্রমিকেরা নিরস্ত্র, অসংঘবদ্ধ। কে তাদের সংঘবদ্ধ করবে? আধুনিক শিক্ষার ফলশ্রুতিতে জন্ম হলো সেই সব সংগঠকের। নুতন যুগের মানুষ এরা, ইন্টেলেকচুয়েল, বুদ্ধিজীবি। মালিক পক্ষেরই লোক তারা জন্মগত ভাবে কিন্তু শ্রেণীহীন সমাজের স্বপ্ন তাদের চোখে। উনবিংশ শতকের শেষে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার তিনটি উপায়ের কথা ভাবা হলো :

> প্রথম উপায় : বুদ্ধিজীবিরা গ্রামে গ্রামে বা শহরের শ্রমিকপল্লীতে গিয়ে স্কুল-কলেজে মাস্টারী করবে এবং এলাকার শোষিত লোকজনদের তাদের বঞ্চনা সম্পর্কে সচেতন করে মালিকের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে তুলবে। এর পর মিছিল, শ্লোগান, অবস্থান ধর্মঘট। মানি না, মানব না। দিতে হবে, দিতে হবে। হুশিয়ার, সাবধান। মালিকের চামড়া... এই প্রচেষ্টার উদাহরণ আজকের মে-দিবস। প্রচেষ্টাটি রাশিয়ায় একবারেই ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়। কৃষকেরা বুদ্ধিজীবিদের শিক্ষা একেবারেই পছন্দ করেনি। বরং বুদ্ধিজীবিদেরকেই তারা উচিত শিক্ষা দিয়েছে। লিস্টি ধরে এই সব বুদ্ধিজীবি কমিউনিস্টিদের তারা তুলে দেয় জারের পুলিশের হাতে। সেই থেকেই রাশিয়ার বুদ্ধিজীবিদির মনে কৃষক সম্পর্কে চরম ঘৃণার সৃষ্টি হয়। এর পর থেকে শ্রমিকদেরকেই তারা বিপ্লবের অধিকতর নির্ভরযোগ্য সহযোগী বলে মনে করতে শুরু করেন। কৃষকদের প্রতি এ ঘৃণা

রাশিয়ার কমিউনিস্ট লেখকদের লেখায় আমি লক্ষ্য করেছি। চেখভের লেখায় পড়েছি : রাশিয়ার কৃষক বাগে পেলে ভগবানকেও খেয়ে ফেলবে। একান্তই কৃষকনির্ভর বিপ্লব বলে চীন বিপ্লবকে স্ট্যালিন প্রথম দিকে পাত্তা দিতে চাননি। নিজের অভিজ্ঞতার কারণে স্ট্যালিনের বদ্ধমূল ধারণা ছিল চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লব সফল হবে না।

দ্বিতীয় উপায় : অস্ত্র সংগ্রহ করে মালিকদের একে একে হত্যা করা হবে। এখানে ওখানে ফাটানো হবে বোমা। সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে শোষকশ্রেণীকে উৎখাত করলেই শ্রেণীবৈষম্য বিলুপ্ত হবে। এর উদাহরণ : নকশাল বাড়ী আন্দোলন। চীন বিদেশে এ ধরণের রাজনীতিতে ইন্ধন যুগিয়েছে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যুগে যুগে নিজেদের রুচি ও সুযোগ মতো এই উপায়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছে, এখনও করছে।

তৃতীয় উপায় : কোন সুযোগে প্রথমেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হবে। এর পর শ্রেণীশত্রু খতম করা কোন ব্যাপারই নয়। ক্ষমতা ধরে রাখতে হবে যে কোন উপায়ে। শক্ত হাতে ঠেকাতে হবে প্রতিবিপ্লব। দয়া, ক্ষমা এসব মানবিক গুনের বিকাশ ঘটাতে দিয়েছো কি মরেছ। বন্দুকের নল থেকে ক্ষমতা বেরিয়ে আসে, সুতরাং তোমাকে অবশ্যই থাকতে হবে বন্দুকের পিছন দিকে। উদাহরণ : সোভিয়েত রাশিয়া, গণচীন। বলুন দেখি, কেমন করে নির্ণয় করা হতো কে শ্রেণীশত্রু আর কে শ্রেণীশত্রু নয়? হাত দেখলেই বোঝা যেত কোনটি শ্রমিক-কৃষকের আর কোনটি মালিকের। তার পর ফাঁসির দড়িটুকু পড়ানোর যা দেরী। মালিক ওপারে চলে গেলে তার এপারের সমস্ত জমি পার্টির সদস্য কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা কি এমন কঠিন কাজ!

৫. অকালবোধন : ইতিহাসের পরিহাস

একটা মজার ব্যাপার খুবই দুঃখের সঙ্গে খেয়াল করতে হয় : পৃথিবীর যে কয়েকটি দেশে শ্রেণীবৈষম্য দূর করার জন্য এই তিনটি উপায় উপর্যুপরি প্রয়োগ করা হয়েছে সেগুলোর একটিও মার্ক্সের তত্ত্বানুসারে কমিউনিজমের উপযুক্ত দেশ নয়। এই সব দেশের একটিতেও পুঁজিবাদের সর্বোচ দূরে থাক, কোন রকম বিকাশই হয়নি। বিপ্লবপূর্ব রাশিয়া আর চীন ছিল একান্তই কৃষিভিত্তিক দু'টি দেশ। বিশেষ কিছু অনুকূল সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক অবস্থার সুযোগে সমাজতন্ত্রীরা এ দু'টি দেশে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। রুশ ও চীনা সমাজতন্ত্র অকালপ্রসূত সন্তান। সার্বক্ষণিক দুর্বলতা আর অকালমৃত্যুই এর স্বাভাবিক ভবিতব্য।

বিশের দশকে চরম অরাজকতা চলছে রাশিয়ায়। জার এত ভালো মানুষ ছিলেন যে তার কোন উপপত্নী পর্যন্ত ছিল না। জারের উপপত্নি থাকবে না এও কখনও হয়! কেমন জার বাবা তুমি? রুশ সমাজের অস্থিরতার কথা তখন সারা পৃথিবীর নেতারা জানেন। জানেন না কেবল জার দ্বিতীয় নিকোলাস। তিনি তাঁর শেয়াল শিকার নিয়ে ব্যস্ত। বিপ্লবকালীণ লেখা জারের রোজনামচা থেকে জানা যাছে, কোন কোন বিষয় সে সময়ে জারের মনোযোগের সিংহভাগ জুড়ে আছে : সন্তানদের ভগ্নস্বাস্থ্য, পত্নীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের টানাপোড়েন... । রুশ সমাজ বা জনগনের কথা কোথাও নেই সেখানে। তিনি লিখছেন : 'শাসন করাটা আমার ঠিক ভালো লাগে না। কেন এসব ঘাড়ে এসে পড়েছে আমার?' (প্রায় একই ধরণের রোজনামচা লিখেছেন শ'দেড়েক বছর আগে ফ্রান্সের ষোড়শ লুই, ১৭৮৯ সালের

জুলাই মাসের প্রথম দিকে। ফরাসী বিপ্লবের সময় তিনিও ব্যস্ত ছিলেন শেয়াল শিকার নিয়ে। কি আশ্চর্য মিল!) এদিকে জারিনা তথাকথিত সুপারম্যান রাসপুতিনের কথা ছাড়া এক পা নড়েন না। মন্ত্রীপরিষদও চলে রাসপুতিনের অঙ্গুলিহেলনে। তখন জার্মানীর সাথে যুদ্ধ চলছে রাশিয়ার। রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধ করলে জার্মানী সর্বশক্তি নিয়ে লড়তে পারে ফ্রান্স আর ইংল্যান্ডের সাথে। লেলিন তখন সুইজারল্যান্ডে বসে লিখছেন তাঁর বিখ্যাত পুস্তক: 'কি করিতে হইবে?' শোনা যায়, জার্মানীর নির্দেশে লেলিন ফিরে আসেন রাশিয়ায়। নিউইয়র্ক থেকে কানাডার হ্যালিফ্যাক্স হয়ে ট্রটস্কী। অক্টোবর বিপ্লব সংঘটিত হলো ১৯১৭ সালে। ক্ষমতা হারানোর পর জার লিখলেন তাঁর রোজনামচায় : 'বাঁচলাম। আর আমাকে রাজ্যশাসনের মতো ফালতু কাজে সময় ব্যয় করতে হবে না।' ব্যয় করার মতো যথেস্ট সময় তিনি পানও নি। অনতিকাল পরেই লেলিনের নির্দেশে এক দল পাঁড় মাতাল লালফৌজ গিয়ে সপরিবারে জারকে হত্যা করে ব্রাশফায়ারে।

চীনেও কউিনিস্টদের ক্ষমতা দখল অভাবনীয় ব্যাপার। বছরের পর বছর ধরে লঙ মার্চ করে পিছু হটছে মাওয়ের লাল ফৌজ। পিছনে ধাওয়া করে আসছে মার্কিন মদদপুষ্ট চিয়াং কাই শেকের বাহিনী। লাল ফৌজ পরাজিত হয় হয়, এমন সময় জাপান আক্রমণ করে বসলো চীন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশে চিয়াং কাই শেক সন্ধি স্থাপন করলো মাওয়ের সাথে। দু'জনে মিলে লড়লো জাপানীদের বিরুদ্ধে। লং মার্চ চলাকালীন চীনের জনগনের সাথে পরিচয় হয়ে গেছে লালফৌজের। যেখানেই থেমেছে তারা, সেখানেই করেছে ভূমিসংস্কার। কৃষকেরা লালফৌজের কাজে সন্তুষ্ট। মহাযুদ্ধের শেষে লাল ফৌজ চিয়াং কাইশেকের বাহিনীকে হটিয়ে নিয়ে গেল তাইওয়ানে। প্রতিষ্ঠিত হলো গণচীন।

৬. সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি : ইওটোপিয়া

সোভিয়েত বিপ্লবের পর রাশিয়ায় কমপক্ষে দুই দুইটি দুর্ভিক্ষ হয়। এর মধ্যে অন্ততঃ একটির সামাল দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশের দশকে রাশিয়াকে মিত্র মনে করতো। আরও একটি কারণ ছিল আমেরিকানদের রুশদেশে যাওয়ার। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স তখন চাইছিল রাশিয়াকে ভাগাভাগি করে নিতে। সংখ্যালঘু বলশেভিকেরা যে অবস্থা সামাল দিতে পারবে না - এ ব্যাপারে সন্দেহ ছিল না কারও। আমেরিকানরা তাই আগেভাগে রাশিয়ায় ঢুকে গিয়েছিল নিজেদের ভাগ বুঝে নিতে। বিপ্লবের পর চীনেও অনেকগুলো দুর্ভিক্ষ হয়। চীনকে সাহায্য করার মতো কেউই ছিল না। একেতো চীনের কৃষকভিত্তিক বিপ্লবের উপর কোন বিশ্বাস ছিল না স্ট্যালিনের, দ্বিতীয়তঃ যখন চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লব টিকে গেল কোন মতে, তখন রাশিয়া কমিউনিজমের এই দ্বিতীয় ধারাটির প্রতি ইর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়ল। কৃষিভিত্তিক তৃতীয় বিশ্বে চীনা কমিউনিজম যে শ্রমিকনির্ভর রাশিয়ান কমিউনিজমের তুলনায় বেশী জনপ্রিয় হবে - এ সন্দেহ তাদের অমূলক ছিল না।

সমাজতন্ত্রের একটা বড় সমস্যা, মানবচরিত্রের বিশেষ কিছু দিককে এই তত্ত্বে হিসেবে রাখা হয়নি। এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে, মানুষ নিয়মমত কাজ করে যাবে এবং তার যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবে রাষ্ট্র। রাশিয়া ও চীন উভয় দেশেই দেখা গেছে, শ্রমিক এভাবে কাজ করে না। একজন শ্রমিক বেশী কাজ করে যদি সে বেশী বেতন পায়। সে কাজ ভালোভাবে করতে চায় যদি এর মূল্যায়ন হয়। উপযুক্ত মূল্যায়ন ছাড়া উপযুক্ত শ্রম পাওয়া মুশকিল। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে এই মানবিক সমস্যাটির প্রায়োগিক কোন সমাধান বের করা যায়নি। শাস্তি দিয়ে, জোর করে সমস্যটিকে চাপা

দিয়ে রাখা হয়েছে। বেশী বেশী খেটে শ্রমিক বিপদে পড়েছে এমন ঘটনাও ঘটেছে। কেউ যদি অন্যদের চেয়ে বেশী কাজ করে তবে সে সবার জন্য একটি খারাপ উদাহরণ। কারণ তখন কর্তৃপক্ষ অন্যদের কাছেও একই রকম কাজ দাবী করবে। সমাজতন্ত্রে উৎপাদন কমে যাওয়ার এটি একটি প্রধান কারণ। কর্তৃপক্ষও কম যায় না। ধরা যাক ১নং ফ্যাক্টরীতে ২নং ফ্যাক্টরীর তুলনায় উৎপাদন বেশী হয়। ১নং ফ্যাক্টরীতেও উৎপাদন বেড়ে যেতে দেরী হয় না, অন্ততঃ কাগজ পত্রে। ধরাধরির কথা ভাবছেনতো? হ্যাঁ ধরাধরি প্রচুর হতো। স্ট্যালিন কমপক্ষে দুইবার সব আমলা বদলে ফেলেন সোভিয়েত রাশিয়ার। আজ আপনি মস্কোতে অফিসার। সপ্তাহখানেক পরে সাইবেরিয়ার শ্রমশিবিরে। কি হল আপনার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের কে তার খোঁজ রাখে। রাশিয়ার ইতিহাসে এসব ঘটনা 'পার্জ' বা 'সংশোধন' (নাকি 'খতম' হবে সঠিক অনুবাদ?) নামে পরিচিত।

রাশিয়া ছিল সবসময় একটি অভাবের অর্থনীতি। খাবারের জন্য লম্বা লাইন তো ইতিহাস হয়ে আছে। অনেক গল্প আছে এ নিয়ে। শশার জন্য তিন মাইল লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মেনচেভের মনে হলো বন্ধু দিমিত্রিকে গিয়ে ডেকে আনিগে। তারওতো শশার দরকার। দিমিত্রির বাড়ী গিয়ে দেখা গেল দিমিত্রি মেনচেভের বউকে নিয়ে শুয়ে আছে। ব্যাপারটাতে এতটুকু অবাক না হয়ে মেনচেভ বললো : 'আমার বউ পালিয়ে যাবে না, কিন্তু ওদিকে লাইন না দিলে শশা জুটবে না কপালে সে খেয়াল আছে?' যত ভাবে পারা যায় ভোগে নিরুৎসাহিত করা হতো মানুষকে। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে ভদকার দাম কমিয়ে দেয়া হতো, যাতে সর্বহারারা মাতাল হয়ে সর্ব দুঃখ ভুলে থাকে। জারদের আমল থেকে এই রাজনীতি চলে আসছে। অন্দ্রোপভ যখন আশির দশকে ভদকার দাম বাড়িয়ে দেন, রাশিয়ার এলকহলিজম কমানোর জন্য তখন জনগণ তা ভালোভাবে মেনে নেয়নি।

আমার ভাবতে দুঃখ হয়, সরদার ফজলুল করিম যখন রাশিয়ান স্ট্যাইল সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখার অপরাধে ঢাকা জেলে কারারুদ্ধ এবং আটান্ন দিনের অনশনে মৃতপ্রায় (অনেক সঙ্গী তাঁর যেমন, শিবেন রায় মৃত্যুবরণ করেছেন ঢাকা জেলখানায়) তখন তিনি জানেনও না যে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ রাশিয়ানদের তুলনায় অনেক সুখে আছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর তাদের দুঃখ বাড়বে বই কমবে না। এমনই ছিল কমিউনিস্ট প্রপাগাণ্ডার শক্তি। উন্নয়নের যুক্তি, সমাজতন্ত্রেই মুক্তি। মিথ্যা, ডাহা মিথ্যা। সার্বজনীন দূর্গামণ্ডপে মার্ক্স আর লেনিনের রচনাবলী প্রদর্শন করা ছাড়া সমাজতন্ত্রের স-ও আসেনি পশ্চিমবঙ্গে গত প্রায় ত্রিশ বছরের কমিউনিস্ট শাসনে। সারাজীবন চীনপন্থী রাজনীতি করেছেন চট্টগ্রামের দেবেন সিকদার। আশির দশকে চীন ঘুরে এসে তিনি এক ব্যক্তিগত আলাপে আমাকে বলেন : 'যদি জানতাম, সমাজতন্ত্র কায়েম হবার চল্লিশ বছর পরেও চীন এত গরীব, তবে সারাজীবন এ ভুল রাজনীতি করতাম না।'

অথচ রাশিয়া ও চীন এই দুই রাষ্ট্র ছিল তৃতীয় বিশ্বের যুবসমাজের আদর্শ : ইউটোপিয়া, কল্পরাজ্য। শুধু তৃতীয় বিশ্বেই নয় উন্নত বিশ্বেও পঞ্চাশ বছর ধরে অনেক বুদ্ধিজীবি সোভিয়েত আর চীন ধাঁচের বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছে, এখনও দেখে। আমি নিজেও দেখতাম। সমাজতন্ত্রকে ভাবতাম 'প্রগতি'। তাই ভাবানো হতো আমাদের। যুগের হাওয়া ছিল সে রকমই। আমি ১৩ বছর বয়স থেকেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতাম। রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতাম না, রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া মনে করতাম। অভিভাবকরা আমার ভাব দেখে হাসতেন। আমার ছোটমামা একদিন বলেছিলেন : 'ত্রিশ বছর বয়সের আগে যে

কমিউনিস্ট হয় না সে হৃদয়হীন। ত্রিশ বছর বয়স হবার পরও যে কমিউনিস্ট থাকে সে বুদ্ধিহীন।' সমাজতন্ত্রের ঘোর আমার বিশ বছর বয়সেই কেটে গিয়েছিল। কিন্তু মানুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আমি এখনও দেখি, চিরকাল তাই দেখবো। বৈষম্য থাকবেই সমাজে কিন্তু আমাদের চেষ্টা থাকবে এই বৈষম্য যথাসম্ভব কমানোর।

৭. নেতাদের গবেষণা ও গিনিপিগ জনগন

রাশিয়ার জাতীয় আর্কাইভ এখন গবেষণার জন্য খুলে দেয়া হয়েছে। আর্কাইভের বিভিন্ন ডকুমেন্ট থেকে বেড়িয়ে আসছে সমাজতন্ত্রের নামে বুদ্ধিজীবি শাসকদের বিচিত্র সব মূর্খতা আর শ্রমজীবি মানুষের উপর নিপীড়নের ইতিহাস। একই ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাবে চীনে, যদি কোনদিন সত্য ইতিহাস লেখা হয়। জনগনের প্রতি কোন প্রকার দায়বদ্ধতা ছিল না সোভিয়েত নেতাদের। এর কারণ সম্ভবতঃ জনগণের প্রতি তাদের সেই আজন্ম বিদ্বেষ। লেলিনের মূল লক্ষ্য ছিল কোনমতে একবার ক্ষমতা দখল এবং তারপর যে কোন মূল্যে সেই ক্ষমতা ধরে রাখা। জনগণকে গিনিপিগ করে রাষ্ট্রনৈতিক গবেষণা চালিয়ে গেছেন লেলিনের উত্তরাধিকারীরা ৭০টি বছর ধরে। কথাটি আমার নয়, বিখ্যাত লেখক ম্যাক্সিম গোর্কীর। লেনিনকে এক চিঠিতে গোর্কী পরিষ্কার লিখেছিলেন : 'লেলিন, কাজটা আপনি ভালো করছেন না। রুশ জনগণ আপনার ল্যাবোরেটরীর গিনিপিগ নয়!' লেলিন গোর্কিকে কোন শাস্তি দেননি। দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু অনতিকাল পরেই কোন এক অজুহাতে গোর্কীর পত্রিকায় কাগজ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকাটিও বন্ধ হয়ে যায় অচিরে।

হাজার হাজার বছর ধরে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতি আর পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়মগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোন মানুষ সচেতনভাবে এগুলো আবিস্কার করেনি। চাহিদা আর সরবরাহের নিয়মে মূল্য নির্ধারিত হবার ব্যাপারটা যত নিষ্ঠুরই মনে হোক, মানব চরিত্রের সাথে এই নিয়ম সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। কমিউনিজম মানুষের সচেতন সৃষ্টি। মার্ক্স এই তত্ত্ব রচনা করেছেন। কিন্তু প্রয়োগের মাধ্যমে তত্ত্বটিকে পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। কমিউনিস্ট অর্থনীতি বলতে কিছুই ছিল না। কমিউনিস্ট রাজনীতিও নূতন একটি ব্যাপার পৃথিবীর মানুষের জন্যে। হটাৎ করে ভুল দেশে, ভুল সময়ে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হবার কারণে সাম্যবাদী নেতারা বুঝতেই পারেননি কি কি করা উচিত। ইছা যে তাদের ছিল না তা নয়। কিন্তু নূতন অর্থনীতির নূতন নিয়ম আবিস্কার করার মতো সময়, মেধা ও আগ্রহ তাদের ছিল না। ইছা আর আগ্রহ এক কথা নয়। ইছা থাকলে উপায় হয় না, আগ্রহ থাকলে উপায় হয়। ফলে একদিকে যখন উজবেকিস্তানে ফল পঁচেছে, অন্যদিকে রাশিয়ার অন্য প্রান্তে ফলের তখন বড়ই অভাব। কারণ কি? বিতরণ ব্যবস্থা বলে কিছু ছিল না রাশিয়ায়। থাকলেও তা একশ দশ পার্সেন্ট সরকারী। একদিকে কোম্পানীকা মাল দরিয়ামে ঢাল্। অন্যদিকে মালের অভাবে অর্থনীতি বেসামাল।

রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ভুল সংশোধনের কোন প্রকার ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ছিল না। ভুল যে হতে পারে এ সম্ভাবনাটাই স্বীকার করা হতো না। জনগণের সুযোগ ছিল না দেশের অর্থনৈতিক অব্যবস্থা নিয়ে সামান্যতম অনুযোগ করার। গুপ্তচর ছিল সর্বত্র। স্বামী স্ত্রীকে, পুত্র পিতাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়ে হিরো হয়েছে এমন ঘটনা প্রচুর ঘটেছে রাশিয়া আর চীনে। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে মাও সে তুঙ ছাত্রদের লেলিয়ে দেন চীনের যা কিছু তারা বুর্জোয়া বলে মনে করে তা ধ্বংস করতে। পুরোনো সব মুর্তি, বইপত্র, মন্দির সব কয়েক বছরে হাওয়া। যদি কিছু রক্ষা পেয়ে

থাকে তবে তা চৌ এন লাই ও তার সহযোগীদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের কারণে। জার্মানীতে নাৎসীরা, ইরাকে সাদ্দাম আর আমেরিকানরা, আফগানিস্তানে তালেবানেরা যা যা করেছে, রাশিয়া আর চীনে কমিউনিস্টরা অনেকটা তাই করেছেন। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, ভিন্ন রূপে, ভিন্ন প্রতিবেশে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সৈনিকদের ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় জাতীয় বীরের মর্যাদা দেওয়া হয়। রাশিয়ার যে সব সৈনিক প্রাণপণ যুদ্ধ করে হিটলারের বাহিনীকে ঠেকিয়েছে, সুদূর বার্লিন পর্যন্ত ধাওয়া করে নিয়ে গেছে নাৎসী জার্মানদের, মহাযুদ্ধের শেষে রাশিয়ায় ফিরে এসে নিজ নিজ পরিবারের সাথে মিলিত হতে পারেনি তারা। এসব সৈনিককে সরাসরি পাঠিয়ে দেয়া হয় সাইবেরিয়ার শ্রমশিবিরে যাতে তারা উন্নত জার্মানী বা ফ্রান্সের গল্প রাশিয়ার জনগণের কাছে করতে না পারে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি মৌলিক অধিকারের এতই দুরবস্থা ছিল তখন রাশিয়ার। আজ পর্যন্ত এর পরিবর্তন হয়নি খুব একটা।

৮. সমাজতন্ত্র সফল না হবার অন্য অনেক কারণও ছিল!

এটা ঠিক যে ভুল দু'টি দেশে সমাজতন্ত্রের অপপ্রয়োগ হয়েছে উচাকাঙ্খী কিছু বুদ্ধিজীবির হাতে। তবে এটিই শেষ কথা নয়। রাশিয়া বাধ্য হয়েছে তার পুরো সোভিয়েত সময় জুড়ে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। সারা পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র ছড়িয়ে দেবার দিবাস্বপ্নের পেছনেও তাদের বাজেটের একটা বড় অংশ চলে গেছে। এছাড়া বাজেটের সিংহভাগই রাশিয়াকে ব্যয় করতে হয়েছে অস্ত্র ও মহাশূন্য অভিযানে। আমেরিকার তুলনায় রাশিয়ার আর্থসামাজিক অবস্থা অনেক অনেক খারাপ ছিল। এ ধরণের অর্থনীতি নিয়ে পৃথিবীর এক নম্বর সামরিক শক্তি হতে চাওয়ার ঘোড়ারোগের মূল্য দিতে হয়েছে রাশিয়ার জনগণকে ৭০টি বছর ধরে।

না, রাশিয়া পৃথিবীর এক নম্বর সামরিক শক্তি হোক - এতে কোন আপত্তি নেই আমাদের। কিন্তু জনগনের মৌলিক অধিকারগুলো পূরণ করে তার পর সেটা করা যেতে পারতো। ক্রুশ্চেভ এই রাজনীতির পরিবর্তন চেয়েছিলেন। অস্ত্রপ্রতিযোগিতা কমিয়ে এনে সমাজতন্ত্রের যা প্রতিশ্রুতি : মৌলিক সব অধিকার তিনি দিতে চেয়েছিলেন রাশিয়ার মানুষকে। কিন্তু পলিটব্যুরোর কট্টরদের সঙ্গে তিনি পেরে ওঠেননি। কিউবার মিসাইল ক্রাইসিসসহ ষাটের দশকের জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও তাঁকে মুষড়ে ফেলেছিল। যদি পরিস্থিতি এত খারাপ না হতো তবে সমাজতন্ত্রের ইতিহাস অন্যরকম হতে পারতো। চীন বা ভিয়েতনাম সাম্প্রতিককালে তাদের সমাজতন্ত্রী রাজনীতি থেকে সরে এসেছে, কারণ এসব দেশের কমিউনিস্ট নেতারা তাদের অর্থনীতি ও রাজনীতির সীমাবদ্ধতা বুঝতে পেরেছেন।

৯. সমাজতন্ত্রে ভালো কিছুই কি ছিল না?

পূঁজিবাদের সবই কি ভালো? না, কে বলেছে পুঁজিবাদ ভালো? আমেরিকায় এখন ধনী আর গরীবের পার্থক্য বাড়ছে দিন দিন। বুশ প্রশাসন যে ক'টি রাজস্ব আইন করেছেন এ পর্যন্ত সব ক'টিই ধনীদের পক্ষে গেছে, প্রকাশ্যে, কোন লুকোছাপা নেই। ধনী-গরীবের আয়ের পার্থক্য এখন আমেরিকায় ১৯২৮ সালের তুলনায় বেশী। তারপরও আমেরিকার গড়পড়তা গরীবের আর্থিক অবস্থা রাশিয়া, চীন বা যে কোন ইসলামী অর্থনীতির গরীবের চেয়ে ভালো ছিল সব সময়। ভালো যদি নাই থাকবে তবে এসব

দেশের গরীবেরা বা এমনকি আমরাও চীন, রাশিয়া, সৌদি আরবে না গিয়ে পুঁজিবাদী দেশগুলোতেই শুধু যেতে চাইবো কেন?

রাশিয়া বা চীনের জনগণ সমাজতন্ত্রের সুফল ভোগ করতে পারেনি। সুফল আসলে ভোগ করেছে পুঁজিবাদী দেশগুলোর শ্রমিকেরা। দেশে দেশে পুঁজিবাদের নগ্ন থাবাকে সংযত করতে বাধ্য করেছে রাশিয়া ও চীনের সমাজতন্ত্র। সব না হারাতে হয় এক সময় - সেই ভয়ে শ্রমের উচ মূল্য দেয়া হয়েছে। সোশ্যাল সিকিউরিটি, জীবনবীমা, কল্যাণভাতা, সাপ্তাহিক দুই দিন ছুটিসহ শ্রমিককে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিতে পূঁজিবাদের রাজী হওয়ার পিছনে মালিকপক্ষের মানবতাবাদী মনোভাব নিয়ামক হিসেবে কাজ করেনি। সমাজতন্ত্রের দৈত্যের কালো ছায়া এ সব পদক্ষেপ নিতে তাদের নিমরাজী করিয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ার অবলুপ্তির পর পূঁজিবাদ আজ আবার কি রকম নগ্ন হয়ে উঠেছে তাতো আপনারা নিজের চোখেই দেখতে পাছেন।

১০. সমাজতন্ত্রের পরাজয় মানুষের পরাজয়

ধরেই নিলাম, ব্যর্থ হয়েছে সমাজতন্ত্র। কিন্তু পূঁজিবাদও তো ভালো কোন অর্থব্যবস্থা নয়। এখন তাহলে সমাধান কি। কেউ জানে না সমাধান কি? পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের মতো অর্থনীতিতেও বছর বছর নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়। কিন্তু নূতন কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভাবন দূরে থাক বাজার অর্থনীতির বিভিন্ন দিক (যেমন, ধরুন, মন্দা, ক্রয়ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি, টাকার মূল্য কমে যাওয়া, ইত্যাদি) নিয়ে অর্থনীতিবিদরা যে সব ভবিষ্যৎবাণী করেন সেগুলো আবহাওয়ার পূর্বাভাসের চাইতেও দূর্বল।

আজ থেকে তিন হাজার বছর আগে প্রাচীন গ্রীসের লোকেরা একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা আর একটি অর্থব্যবস্থা কল্পনা করে সে দু'টির প্রয়োগ করেছিল তাদের ছোট ছোট নগরে। রাষ্ট্রব্যবস্থাটি হছে গণতন্ত্র আর অর্থব্যবস্থাটি হছে পূঁজিবাদের একেবারে প্রাথমিক সংস্করণ। ভারতবর্ষেও দু'টি নগর : বিহারের বৈশালী আর পাঞ্জাবের তক্ষশীলায় এক ধরণের গণরাজ্য ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের অধীনেও কিছু কিছু গ্রীক গণরাষ্ট্র টিকে ছিল অনেক দিন। কিন্তু বড় বড় সাম্রাজ্যের চাপে ভারতের গণরাষ্ট্রগুলো দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারেনি। অনেক অনেকদিন পরে মধ্যযুগের শেষে আবার যখন পিপলস্ রিপাবলিক বা গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করলো তখন পুনরায় খোঁজ পড়লো গ্রীক গণতন্ত্রের। হাজার তিনেক বছরের পুরোনো এ দু'টি ব্যবস্থা : গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের ঝাপসা ফটোকপি করে করে মানুষ আজও তাদের সমাজ ও রাষ্ট্র চালাছে। নুতন কোন রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থা মানুষ এখনও আবিস্কার করতে পারেনি।

এ ব্যর্থতা মানুষের, মানব সমাজের। আমরা ভাবি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান জটিল আর সামাজিক বিজ্ঞান অপেক্ষাকৃত সহজ একটি বিষয়। ভালো ভালো ছাত্রদের সমাজ ঠেলে দেয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দিকে। অঘাগুলো সামাজিক বিজ্ঞানে গিয়ে ভর্তি হয়। ইদানিং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেরও বাজার কমেছে, সবাই ছুটছে প্রযুক্তির দিকে : আই.টি. (এর পরের ধাপে আসবে ই.টি!)। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে অনেক বড় বড় আবিস্কার করেছে মানুষ গত শ' খানেক বছরে : আকাশ জয় করেছে, সাগরের তলদেশে পৌছেছে, জয় করেছে পাহাড় চূড়া। কিন্তু এখনও জয় করতে পারেনি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের মতো আদি

সমস্যা। এই দুই সমস্যার সমাধানে মানুষ এখনও বেছে নিতে বাধ্য হয় মানবসভ্যতার প্রাচীনতম দুই পেশা : ভিক্ষাবৃত্তি ও বেশ্যাবৃত্তি। মানুষ প্রাণরক্ষার সেই আদিম তাগিদে পরস্পরকে আক্রমণ করে, এক জাতি অন্য জাতিকে দাস বানিয়ে রাখতে চায়, এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর ইতিহাস ধ্বংস করে। এই যদি হয় অবস্থা, তবে কি করে বলি যে মানুষ পশুত্বের উর্ধ্বে উঠেছে? মাটির পৃথিবীর মৌলিক সব সমস্যার সমাধান না করে মহাশূন্যে যাবার কি ফায়দা? যুবসমাজের নেশা সমস্যারই সমাধান হলো না, কি হবে নাসার গবেষণা দিয়ে? পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আগে আগে মানুষ নাকি মহাশূন্যের অন্য কোথাও অভিবাসন করবে। দুর্ভিক্ষ-মহামারী-যুদ্ধে মানব প্রজাতি ততদিন টিকলে হয়!

মানবসভ্যতার ইতিহাসে কার্ল মার্ক্স বিস্ময়কর একটি প্রতিভা। প্রায় একক প্রচেষ্টায় নূতন একটি অর্থ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার তত্ত্ব রচনা করেছিলেন তিনি। সামাজিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ ধরণের ঘটনা বিরল। মার্ক্সের সাম্যবাদী তত্ত্বের প্রয়োগ সমাজবাদী নেতারা ঠিকঠাক মতো করতে পারেননি। সেটা সাম্যবাদী তত্ত্বের দোষ নয়। তত্ত্ব এক কথা আর তার প্রয়োগ আর এক। প্রয়োগে ভুল হলে তত্ত্ব কাজ করবে না। কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কাজ না করার মানে সব সময় কিন্তু এই নয় যে তত্ত্বটিতে মারাত্মক কোন ভুল আছে। যদি থাকে তবে এমনও হতে পারে যে ভুলটি সংশোধনযোগ্য। রাশিয়া, চীন, কিউবা বা পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধিজীবিরা নিজেদের মতো করে ভিন্ন ভিন্ন আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে মার্ক্সের তত্ত্ব প্রয়োগ করে ব্যর্থ হয়েছেন। এই ব্যর্থতা মার্ক্সীয় তত্ত্বেরই ব্যর্থতা - এ কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না।

মার্ক্স অন্ততঃ চেষ্টা করেছিলেন। দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে যারা যুক্ত ছিলেন, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, জীবনের বড় একটা অংশ কাটিয়ে দিয়েছেন যাঁরা জেল-জুলুম-নির্যাতন সয়ে, তারাও চেষ্টা করেছেন মানুষকে উন্নততর একটি ব্যবস্থা উপহার দেবার। নূতন একটি পন্থার জন্ম দিয়েছেন তাঁরা : বামপন্থা। সব পন্থার মধ্যেই কিছু আগাছা থাকে। ভন্ড বামপন্থীদের (যাদের দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : ভাম ও অতিভাম) কথা বাদ দিলে বেশীর ভাগ বামপন্থীর মনে সাধারণ মানুষের প্রতি ভালোবাসার কোন কমতি ছিল না। বামপন্থা আপাততঃ ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু সমাজপরিবর্তনে হাজার হাজার বামপন্থী নেতাকর্মীর চেষ্টা আর সদিচ্ছার কথা মানবসভ্যতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা উচিত।

১১. ধর্ম ও রাজনীতি : এক বৃন্তে দু'টি ফুল!

'পূঁজিবাদ সেতো অভিশাপ। সমাজতন্ত্র সেতো আত্মার বন্দিশালা। হে মানুষ বাঁচতে চাও কি? আল কোরান হাতছানি দিয়ে ডাকে।' দেয়ালে দেয়ালে একটি ধর্মীয় সংগঠনের চিকা। প্রয়োগে ভুল হতে পারে কিন্তু একাধিক দেশে অন্ততঃ চেষ্টা করে দেখা হয়েছে সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের বিকল্প হতে পারে কিনা। কিন্তু গত চৌদ্দ শত বৎসরে কোন মুসলিমপ্রধান দেশে ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা করা হয়নি। ইরাণ, সৌদি আরব বা পাকিস্তানের সরকার আসলেই ইসলামী কি না সে ব্যাপারে ঐসব দেশের মুসলমানদের ঘোর সন্দেহ রয়েছে যদিও এই দেশগুলোর সরকার অন্যান্য দেশে ইসলামী সরকারকে ক্ষমতায় দেখতে চায়। এ অনেকটা রাশিয়ার পূর্ব ইওরোপে জোর করে সমাজতন্ত্র কায়েম করার মতো। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদকে 'লাভ' বলে চালানো সত্বেও তেল

বিক্রির কাড়ি কাড়ি টাকা আরব শেখেরা জমা রাখে বিদেশের অনৈসলামিক ব্যাংকগুলোতে, যেন হারাম সুদ জমে জমে সে টাকা দিনে দিনে বাড়তে থাকে।

'হিন্দুত্বে তোমার জন্মগত অধিকার। হে যুবক, তোমাকে বৈদিক অভিনন্দন!' বেনাপোল বর্ডার পার হয়ে পশ্চিমবঙ্গে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি ধর্মীয় সংগঠনের চিকা চোখে পড়বে আপনাদের। এদের লক্ষ্য 'রামরাজ্য'। কখন ছিল সে রাজ্য, কার বাবার সাধ্য বলে, কিন্তু কেমন ছিল সে রাজ্য তা আমরা জানতে পারি রামায়ণ পড়ে। যে রামরাজ্যের মূলা ঝোলায় বি.জে.পি. ভারতের বর্ণহিন্দুদের সামনে সেটি হচ্ছে এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা যেখানে হিন্দু শুদ্রের পর্যন্ত জ্ঞান অর্জনের অধিকার নেই, মুসলমানতো অনেক দূরের কথা। রামচন্দ্র নিজের হাতে শুদ্র শম্বুকের শিরচ্ছেদ করেছিলেন বেদপাঠ করার অপরাধে।

ইসলামে দাসদের প্রতি ভালো ব্যবহার করার উপদেশ দেয়া হয়েছে কিন্তু দাসপ্রথাকে উচ্ছেদ করা হয়নি। চৌদ্দশত বৎসর আগের সমাজে সেটা সম্ভব ছিল না (এর পরও মানুষে মানুষে যতটুকু সাম্যের বিধান দেওয়া হয়েছে ইসলামে তা অন্যান্য ধর্মগুলোতে বিরল)। গণতন্ত্রের সূতিকাগার গ্রীস নগরগুলোতেও দাসপ্রথা ছিল। দার্শনিক প্ল্যাটো পর্যন্ত একবার বিক্রি হয়ে গিয়েছিলেন দাস হিসেবে। পরে এক পরিচিত লোক তাঁকে কিনে নিয়ে মুক্ত করেন। দাস, মহিলা ও বিদেশীরা গ্রীক গণতন্ত্রে ভোট দিতে পারতো না। রামরাজ্যেও এই দাসত্বের অস্তিত্ব রয়েছে। আজকের পৃথিবীতে কি মানুষের দাসত্ব মেনে নেয়া সম্ভব? ভারতের সংখ্যাগুরু শুদ্ররা কখনই রামরাজ্যের মত একটি সমাজব্যবস্থাকে মেনে নেবে না, আদবানী যত জোরালো বাণীই তাঁর দিন না কেন।

মানব ইতিহাসের বড় একটি অংশ জুড়ে ধর্ম আর রাজনীতি এক বৃন্তে দু'টি ফুল হয়ে ছিল। কিন্তু মানুষ কালক্রমে বুঝতে পেরেছে ধর্মকে রাজনীতির সাথে জড়ালে সমস্যা আছে। সমাজ ও রাষ্ট্র যুগে যুগে বদলায়। পরিবর্তিত রাষ্ট্র ও সমাজকে যদি নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তবে এর নিয়মগুলোকেও বদলাতে হবে। যস্মিন দেশে যদাচার। সমাজ বা রাষ্ট্রের নিয়ম যত সহজে বদলানো যায়, ধর্মের নিয়মগুলো তত সহজে বদলানো যায় না। এর সাথে মানুষের সেন্টিমেন্ট জড়িত। ধর্মীয় নিয়মের সমালোচনা করলে পর্যন্ত মানুষ আহত হয়, আরও জোরে আঁকড়ে ধরতে চায় সে নিয়মগুলো। ঠিক এই ব্যাপারটাই তসলিমা নাসরিনের মতো বুদ্ধিজীবিরা বোঝেন না। শিশু পুতুল নিয়ে খেলছে। তার হাত থেকে পুতুলটা কেড়ে নিতে পারি, কিন্তু শিশুর কান্না থামাবো কি দিয়ে? পুতুলের চেয়ে ভালো কিছু হাতে দিতে না পারলে শিশুর পুতুলখেলা বন্ধ করে কি লাভ? বুদ্ধিজীবিরা সবসময় নিজেদের রুচি ও মেধা দিয়ে শ্রমজীবি সাধারণ মানুষকে বিচার করে থাকেন। শ্রমজীবিদের সমতলে নেমে এসে শ্রমজীবিদের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সমস্যা বিশ্লেষণ করতে পারেন না। এটি ভুল একটি পদ্ধতি। বুদ্ধিজীবি ও শ্রমজীবি - এ দু'টি শ্রেণীর মানসিক বিকাশের ধরণ এক নয়। বেশীরভাগ রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সমস্যার সৃষ্টি হয় নেতা ও কর্মীদের মধ্যে উচতার অতি তারতম্যের কারণে। উচতার ফারাক থাকবেই কিন্তু দেখতে হবে সেই পার্থক্য যেন খুব বেশী বেড়ে না যায়।

'ধর্ম জনগনের আফিম' বললে মহান নেতার প্রতি প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ জনগন কিছু দিনের জন্য আফিম হয়তো ছেড়ে দেবে কিন্তু অচিরেই গাঁজা বা মদ ধরে বসবে। যারা ধর্মকে আফিম বলেন, তারা

ধার্মিকও নন, নেশাও করেন না। নেশার সাথে ধর্মের কোন তুলনাই হয় না। নেশা আর অধর্মের তুলনা অবশ্য হতে পারে। সত্যিকার ধর্মে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না, নেশা শরীরকে ধ্বংস করে দেয়। ঠিকমত পালন করতে পারলে ধর্মে মনেরও কোন ক্ষতি হয় না। ধার্মিক লোকদের মুক্তমনা ও অন্য ধর্মের প্রতি উদার হতে বাধা নেই। পৃথিবীর যে কোন প্রার্থনার মূল কথা (হতে পারে তা এলাকার কর্তাব্যক্তি বা সৃষ্টির কর্তার কাছে) : 'তুমি সবার বড়। আমাকেও বড় কর! তোমার অনেক আছে। দিলে প্রাণটা বাঁচে!' বেশীর ভাগ ধর্মের প্রার্থনা রচিত হয় অপরিচিত একটি ভাষায়। সবটা বোঝা যায় না। বোঝা গেলেও ক্ষতি নেই। দু'নম্বরী মানুষের তিন নম্বরী প্রার্থনায় সৃষ্টিকর্তা কান দিন বা না দিন প্রার্থনা করাকালীন বা করার পর মানুষ নিজের মনের মধ্যে একাধিক হর্সপাওয়ারের শক্তি অনুভব করে। অশান্ত মন শান্ত হয়। নেশাখোরদের মানসিক শান্তি কোথায়? মাও চীনাদের আফিম খাওয়া বন্ধ করলেন। সিগারেটের নেশা ছাড়তে অনেকে যেমন চিউইংগাম চিবায়, চীনাদের মুখেও ঢুকিয়ে দেয়া হলো নুতন এক চিউইংগাম : মাওবাদী কমিউনিজম। প্রথম দিকে খুব মিষ্টি, চিবাতে ভালোই লাগে। কিন্তু একই জিনিষ চিবাতে চিবাতে মাড়ি ধরে যায় এক সময়। তার পর, থুঃ। চীনারা থুতু ফেলতে এত ভালোবাসে বলেই বোধ হয় সিঙাপুরের রাস্তায় থুতু ফেললে ডলার ধরে জরিমানা করা হয়।

যদি পৃথিবীতে একটি মাত্র ধর্মই থাকতো তবে সেই ধর্মটির নিয়ম কমবেশী চালানো যেতে পারতো সব দেশে। কিন্তু জীবনের প্রধান একটি ধর্ম হচ্ছে বৈচিত্র্য। অনেক চেষ্টা করেও পৃথিবীকে একটি মাত্র ধর্মের অধীনে আনা যায়নি। ধর্মগ্রন্থে যাই লেখা থাক, ইওরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোতে ধর্মীয় বৈচিত্র্য সহ্য করা হয়নি দীর্ঘকাল ধরে। এর ফলে এসব দেশে এক সময় ধর্মীয় সংখ্যালঘু ছিল না বললেই চলে। কিন্তু গত শ'খানেক বছর ধরে আবার প্রায় সব ধর্মের লোক সব দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। সবাই নিজ নিজ ধর্মকে আঁকড়ে থাকতে চায়। ধর্মের উর্ধ্বে খুব কম মানুষই উঠতে পারে। কমিউনিস্ট দেশে ধর্মপালনে কড়াকড়ি ছিল। কিন্তু মার্ক্স-লেলিন-মাওয়ের মূর্তিতে ফুল দেয়ায় বারণ ছিল না। রাশিয়ায়তো অর্ধশতাব্দী ধরে লেলিনের শবপূজা পর্যন্ত করা হলো। পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট নেতারা মারা গেলে তাদের হরিধ্বনি দিয়ে দাহ করা হয় শ্মশানে। মানুষ কোনও না কোন ভাবে ধর্মপালন করবেই। তবে সবচেয়ে বেশী পালন করে মানুষ নিজের ধর্মটা। অন্ততঃ পালন করার ভাব করে। সুতরাং, এক ধর্মের লোকেরা অন্য ধর্মের নিয়ম মানতে চাইবে না, অন্ততঃ খুশী মনে চাইবে না - এ কথা চোখ বুজে বলে দেয়া যায়।

ধর্ম জীবন বৃক্ষের একটি ফল। জীবনের বৈচিত্র্য সঞ্চারিত হয় ধর্মে। ধর্মের নিয়মগুলোকে আমরা যতই অপরিবর্তনশীল মনে করি ততটা অপরিবর্তনশীল কিন্তু সেগুলো নয়। তাই যদি হতো তবে খ্রীস্টান ধর্মের এতগুলো শাখা সৃষ্টি হতো না, আর খ্রীস্টানরা একে অপরের সাথে সংঘর্ষেও লিপ্ত হতো না। একই কথা বলা যায় ইসলাম সম্পর্কেও। ইন্দোনেশিয়ার ইসলাম, ইরাণের ইসলাম আর সউদী আরবের ইসলাম এক, আবার তাদের মধ্যে লক্ষ্যনীয় পার্থক্যও আছে। মুসলমান সুকর্ণের কন্যার নাম মেঘবতী, বা মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর নাম মাহাথীর (তদ্ভব শব্দ < মহাস্থবির) হতে বাধা নেই কিন্তু এ ধরণের নামকে অনৈসলামিক বলে রায় দিয়ে দেবেন বাংলাদেশের অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ।

রোগের মতো ধর্মও দুই প্রকার : ১. সংক্রামক ও ২. বংশগত। কোন কোন ধর্ম শুধুই বংশগত, যেমন হিন্দু ও ইহুদী ধর্ম। সাধারণ নিয়ম হলো এই যে বাপ-মা দুজনেই হিন্দু না হলে সন্তান হিন্দু হবে না। সংক্রামক ধর্মের নিয়ম এতটা কড়া নয়। এসব ধর্মের যাজকেরা অনুসারীর সংখ্যা বাড়াতে চান, কারণ শিষ্যের সংখ্যা যত বেশী হবে, দক্ষিণার পরিমানও সেই পরিমাণে বাড়বে। যে কোন ধর্মই চায় নিজের অনুসারীদের বিশেষ সুবিধা দিতে। না হলে মানুষ সে ধর্মকে বেছে নেবে কেন? মানুষতো সুবিধার পাগল। রামরাজ্যে অ-হিন্দুরা বা সত্যিকার কোন ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানেরা যে সমান সুযোগ সুবিধা পাবেন না- এ কথা বলাই বাহুল্য। ইসলামী আইনে কাফের হত্যা আর মুসলমান হত্যার শাস্তি সমান নয়। ইসরাইলে ইহুদী আর মুসলমানেরা সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন না।

ভাটিকানের মতো ছোটখাট কোন রাষ্ট্র ধর্মীয় নিয়ম কানুন দিয়ে চালানো অসম্ভব নয়। কিন্তু কোটি কোটি জনসংখ্যাবহুল আজকের পৃথিবীর কোন নগর বা রাষ্ট্রে গ্রীক স্ট্যাইল গণতন্ত্র বা ধর্মরাজনীতির প্রয়োগ করা সহজ নয়। ইসলামী খিলাফত বা গ্রীক গণতন্ত্র এ দু'টি শাসনব্যবস্থা পরিকল্পিত হয়েছিল ছোট ছোট নগরের কথা মাথায় রেখে যেখানে লোকসংখ্যা হবে হাজার পাঁচ দশেক। হজরত ওমর সারারাত নগর পরিভ্রমণ করে জনগণের অভাব অভিযোগ জানতে পারতেন কারণ তখন নগরের আয়তন ছোট ছিল। আমাদের দেশের কোন এক শাসক স্বপ্নাদেশ পেয়ে প্রতি শুক্রবারে নূতন নূতন মসজিদে নামাজ পড়তে যেতেন কিন্তু সৎ বা অসৎ যে উদ্দেশ্যে নিয়েই হোক প্রতি রাতে ঢাকা বা কলকাতার মতো মহানগরী পরিভ্রমণ করা কোন শাসক বা শাসিকার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

ধর্মীয় নিয়ম দিয়ে পরিবতনশীল পৃথিবীর নূতন সমাজ চালানো যাবে না। চালাতে গেলে লাগবে দাঙ্গা, যুদ্ধ, হবে প্রাণক্ষয়। ধর্মগুরুরা অবশ্য বলবেন : এ জেহাদ, ধর্মযুদ্ধ। ধর্ম বা অধর্ম যে যুদ্ধই হোক, যুদ্ধের ধর্ম একটাই, নিরপরাধ মানুষের প্রাণহরণ। প্রাণরক্ষার কোন রকম মাথাব্যথা ধর্মগুরুদের নেই। বাঁচলে গাজী, মরলে শহীদ। কিন্তু প্রাণ গেলে ধর্ম দূরে থাক, কিছুই আর থাকে না। সুতরাং প্রাণরক্ষাই হওয়া উচিত আমাদের লক্ষ্য। প্রাণ দেওয়া যায় না, নেওয়াও যায়না। হত্যা এবং আত্মহত্যা দুইই মহাপাপ। কেন মহাপাপ? মহাপাপ এ জন্যে যে প্রাণ অমূল্য বস্তু। সাধারণ বস্তু হরণ করা পাপ। অমূল্য বস্তু হরণ করা মহাপাপ। প্রাণ আপনার অর্জিত কোন সম্ত্তি নয়। আপনি তা দিতে বা নিতে পারেন না। প্রাণধ্বংসের যাবতীয় সম্ভাবনা যথাসম্ভব পরিহার করা উচিত। ধর্মের নিয়ম দিয়ে রাষ্ট্র বা সমাজ চালাতে গেলে প্রাণরক্ষার কাজটা ঠিকভাবে করা যায় না। প্রাণের বিকাশ ঘটাতে হলে কোন সমাজে ধর্ম ও রাজনীতিকে যথাসম্ভব আলাদা রাখা উচিত - এটাই মানব ইতিহাসের শিক্ষা। ধর্মীয় মৌলবাদীরা অবশ্য ইতিহাসের এ শিক্ষায় বিশ্বাস করে না।

১২. মৌলবাদ

আইনের চোখে সব মানুষের সমান অধিকার। তোমার সঙ্গে আমি একমত হতে না পারি কিন্তু তুমি যাতে নিসঙ্কোচে তোমার মত প্রকাশ করতে পার তার জন্য আমি আমার জীবন দিতে পারি... ভলতেয়ারের কথা (আমি হলে জীবন দেয়ার কথা বলতাম না!)। পাশ্চাত্য দর্শনের এই সব কাম্য আদর্শকে বুদ্ধিজীবি অনেক শাসক দু'পায়ে মাড়ায়। এরা মৌলবাদী। হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, নাস্তিক, কমিউনিস্ট, ক্যাপিটালিস্ট ... সব আদর্শেই মৌলবাদের জন্ম হতে পারে। মৌলবাদী দুই প্রকারের হয়ে থাকে : মূর্খ মৌলবাদী ও ভণ্ড মৌলবাদী। আদর্শের জন্য হাসতে হাসতে নিজের জীবন দিতে ও

অন্যের জীবন নিতে পারে মূর্খ মৌলবাদীরা। জীবনের চেয়ে আদর্শের দাম বেশী তাদের কাছে। সমস্যা হচ্ছে এই যে আদর্শটি সঠিক না ভুল তা যাচাই করার মতো মানসিক প্রস্তুতি এ ধরণের মৌলবাদীদের থাকে না। অন্য কেউ যে তাদের ভুল দেখিয়ে দেবে তাও মানতে পারে না মূর্খ মৌলবাদীরা। অন্যের মত সহ্যই করতে পারে না তারা। বিরূপ মতের প্রকাশক কোন কণ্ঠকে রোধ করাকেই তারা শ্রেয় মনে করে। তাদের মানসিক গঠনটাই এমনতর। চিন্তা করার চেয়ে জীবন দিয়ে শহীদ হওয়া বা জীবন নিয়ে গাজী হওয়া সহজতর (এবং লোভনীয়) একটি কাজ এদের জন্যে। কিন্তু নিজের স্বার্থের কথা ভেবে এসব করে না তারা। আদর্শের প্রতি কমবেশী বিশ্বস্ত মূর্খ মৌলবাদীরা। তারা মূর্খ, কিন্তু অসৎ নয়।

ভন্ড মৌলবাদীরা মূর্খ নয় কিন্তু তাদের সব কার্যক্রম পরিচালিত হয় নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। এটা অন্য এক ধরণের মানসিক গঠন। আদর্শের কথা তারা মুখে বলে কিন্তু মনে মনে বিশ্বাস করে না। আদর্শকে ভণ্ড মৌলবাদীরা তাদের স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যবহার করে। সবসময়েই এদের মূল লক্ষ্য থাকে ক্ষমতা দখল এবং যে কোন মূল্যে তা ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা। এর জন্যে লক্ষ লোকের জীবনও যদি চলে যায় তাও সই। রাজনীতি এদের কাছে একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় অগ্নিকুণ্ড এবং এক একটি মানুষ এই আগুনের পাটকাঠি। এই অগ্নিকুন্ডের নিয়ন্ত্রক হয়ে এক ধরণের বিকৃত আনন্দ পায় এই সব মৌলবাদী শাসকেরা। হিটলার, স্ট্যালিন, সাদ্দাম, বুশসহ বেশীর ভাগ স্বৈরাচারী শাসক কমবেশী ভণ্ড মৌলবাদী। মূর্খ মৌলবাদীদের অন্য সব বৈশিষ্ট্যই ভন্ড মৌলবাদীদের থাকে, একটি বৈশিষ্ট্য ছাড়া। বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে এই যে তারা মূর্খ নয়, ধান্দাবাজ। প্রায়শঃই মূর্খ মৌলবাদীরা তাদের বুদ্ধির স্বল্পতার কারণে ভণ্ড মৌলবাদীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মূর্খ ও ভণ্ড এই উভয় ধরণের মৌলবাদই যে কোন সমাজের জন্য বিপদজনক। যে কোন রূপ ধরেই আসুক না কেন এই দুই ধরণের মৌলবাদ, কোন সমাজ যদি এর কোনটিকেও প্রশ্রয় দেয় তবে সেই বিশেষ সমাজের কপালে দুঃখ আছে। মৌলবাদ অত্যন্ত সংক্রামক একটি সমাজ-মানসিক রোগ। এই রোগ নিরাময় হতে কয়েক প্রজন্ম লেগে যেতে পারে।

১৩. শ্রেণীবৈষম্য ও বিপ্লব

শ্রেণীহীন সুসম সমাজ একান্তই কল্পলোকের গল্প। সমাজতন্ত্রের তিক্ত অভিজ্ঞতা বলে, দুনিয়ার মজদুর এক হতে পারে না। তাদেরকে এক করতে কিছু বুদ্ধিজীবি প্রয়োজন। ক্ষমতা এই বুদ্ধিজীবিদের হাতেই থাকে, কারণ শ্রমিকের বুদ্ধি আর শিক্ষা দিয়ে রাষ্ট্রচালনার মতো জটিল কাজ চালানোর কথা কল্পনাও করা যায় না। ইসলামী রাষ্ট্র যদি আসলেই প্রতিষ্ঠিত হয় কোন এক দিন তবে সেখানে ক্ষমতা থাকবে মোল্লাদের হাতে আর রামরাজ্য চালাবে আধুনিক ব্রাহ্মণেরা। হতে পারে তখন রামের উপর ট্যাক্স তুলে নেওয়া হবে। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা রাম খাওয়া শুরু করলে ভারতবর্ষে 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠিত হতে দেরী হবে না। এ রকম হতে বাধ্য, কারণ বুদ্ধিজীবি আর শ্রমিক এই দু'টি শ্রেণীর স্বার্থ কখনও এক হতে পারে না। রাজা বা মালিকশ্রেণীর কাছ থেকে কিছুটা মৌলিক অধিকার পাওয়া গেলেও যেতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিজীবি শাসকের দল জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে, কি সমাজতন্ত্রে, কি তথাকথিত ইসলামী দেশগুলোতে। এমনকি ইসলাম যে সাম্যের কথা বলে তা কখনই ছিল না কোন মুসলমান সমাজে। প্রমাণ, মুসলমানদের হওয়ার কথা 'ভাই ভাই' অথচ দেখুন, সউদী আর ইরাকীরা পরস্পরকে তারা বলছে 'বাই বাই'।

বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক। বিপ্লব কি? ‘প্লব’ মানে লাফ (ব্যাঙকে বলা হয় ‘প্লবগ’ জাতের প্রাণী কারণ ব্যাঙ লাফিয়ে চলে) বি-প্লব মানে বিশেষ ‘প্লব’ বা বিশেষ ধরণের লম্ফ। এক ধরনের উদ্ভট লাফালাফি আর কি! তাতেই সমাজের বারোটা যা বাজার বেজে যায়। পুরোনো ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়ে। একেতো নূতন ব্যবস্থা তৈরী হতে সময় লাগে, তদুপরি নূতন ব্যবস্থা পুরোনো ব্যবস্থার চেয়ে ভালো এ কথা প্রমাণ করা শক্ত। সোজা কথায়, ‘বিল্পব’ হচ্ছে ক্ষমতার ওলটপালট। ফরাসী বিপ্লবে রাজতন্ত্র গিয়ে বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সব বদলে দিয়েছিলেন বিপ্লবীরা। নূতন মাস, নূতন সাল শুরু হলো : বিপ্লববর্ষ। গীর্জায় যাওয়া নিষিদ্ধ হলো। শুরু হলো যুক্তিদেবীর পূজা। এখানে ওখানে যুক্তিদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠার ধুম পড়ে গেল। ক’বছর পরে আবার যে কে সেই। অতি বাড় বেড়ো নাকো ঝড়ে পড়ে যাবে। অতি বড় হয়ো নাকো ছাগলে মুড়োবে। বিপ্লবের কচি পাতা সম্রাটের ছাগলে খেয়ে নিল। বিপ্লবীরা ব্যর্থ হলো দেশ চালাতে। আসলেন সম্রাট নেপোলিয়ন। রাজার হাত থেকে রক্ষা পেতে না পেতেই ফরাসী জনগণের ভাগ্যে জুটলো সম্রাট ! ফ্রাইপেনের গরম তেল থেকে বাঁচার জন্যে লাফিয়ে পড়লো তারা ডেকচীর ফুটন্ত জলে। তার পরের ইতিহাসতো আমরা সবাই জানি : যুদ্ধ যুদ্ধ যুদ্ধ। প্রথম দিকে জয় আর শেষ দিকে কেবলই পরাজয়। জানি না, নেপোলিয়ন কত শত বৎসরের জন্য ফরাসী জাতিকে পিছিয়ে দিয়ে গেছেন। নেপোলিয়ন একের পর এক ভুল না করলে হয়তো ফরাসীরা আজ বিশ্বরাজনীতিতে ইংরেজীভাষীদের তুলনায় এগিয়ে থাকতো, ফরাসী ভাষা পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানে না থেকে থাকতো প্রথম স্থানে।

রুশ বিপ্লবেও প্রায় একই ঘটনা ঘটেছে। জারতন্ত্র বিলুপ্ত করে বলশেভিকরা ক্ষমতায় আসেন। বলশেভিক আমলে রাশিয়ার জনগন কি সুখে-শান্তিতে ছিল? বলশেভিকরাও এ দাবী করে না আজকাল। নৃশংসতায় লেলিন-স্ট্যালিন গং জারকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। চীন বিপ্লবের নেতারাও যে খুব একটা মোলায়েম মনের লোক নন, তা তিয়েনআনমেনের ঘটনা থেকেই বোঝা গেছে। তিয়ানমেন চত্বরে প্রতিবাদ যারা করেছিলেন সেই ছাত্রদের সবার কপালে জুটেছে (আক্ষরিক অর্থে) এক একটি বুলেট। মাসখানেক পরে তাদের সবার বাপমায়ের কাছে এক একটি বিল চলে আসে যাতে বুলেটের খরচটিও ধরা ছিল। ইরাণে ইসলামী বিপ্লবের নামে জনগনের উপর কোন দুরমুশ চালানো হচ্ছে তা কোন একদিন হয়তো জানা যাবে।

সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন সব সময় বিপ্লবের মাধ্যমে আসে না। সত্যিকারের দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন ধীরে ধীরে নিজে থেকেই হয়। পৃথিবীর যে কোন বিপ্লবের ইতিহাস যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যাবে বিপ্লব বলে যাকে চালানো হয় তা আসলে দুই দল বুদ্ধিজীবির ক্ষমতা দখলের লড়াই। একদল বুদ্ধিজীবি ক্ষমতা হারাবে অন্য দলের হাতে। এই খেলো ঘটনাটিকে মহিমা দেবার জন্যে বুদ্ধিজীবি লেখকেরা এর নাম দেয় : ‘বিপ্লব’। বুদ্ধিজীবি এক বা একাধিক নেতা হ্যামেলিনের বাঁশি বাজায় আর উলুখাগড়া জনগণেশ তাদের বাহন ইঁদুরের পালে সওয়ার হয়ে দলে দলে গিয়ে ঝাপ দিয়ে পড়ে আগুন বা পানি যেখানেই হোক। পুড়েই হোক বা ডুবেই হোক, মৃত্যুই যে কোন বিপ্লবে জনগনের পরম প্রাপ্তি। সুতরাং বিপ্লব যত দীর্ঘজীবি হবে জগগনের সুখশান্তি হবে তত স্বল্পজীবি। বিপ্লব প্রাণের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর একটি অবস্থা।

১৪. এবং স্বৈরাচার

মানুষের মস্তিস্কে দু'টি মডিউল আছে : প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি। মস্তিস্কের প্রবৃত্তি মডিউল মানুষকে স্বৈরাচারী হতে উসকে দেয়। আমি বুশ। আমার মনমতো যদি না চলো, তবে ঠুস। নিবৃত্তি অংশ প্রবৃত্তি মডিউলকে সামলে রাখে। নিবৃত্তি মডিউল যদি দুর্বল হয় তবে মানুষ কমবেশী স্বৈরাচারী হয়ে উঠে। ব্যষ্টিক স্বৈরাচার তিল তিল করে যোগ হতে হতে এক সময় পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রকে স্বৈরাচারের প্রতি সহনশীল করে তোলে। স্বৈরাচার বা অগণতান্ত্রিকতার শুরু হয় পরিবারে এবং এক সময় এটা দু'টি বদ গুন ছড়িয়ে পড়ে সমাজে। পরিবার যদি গণতান্ত্রিক না হয় তবে সমাজ, বিভিন্ন সমাজ-রাজনৈতিক সংগঠন গণতান্ত্রিক হতে পারে না। এর উজ্জ্বল উদাহরণ : বাংলাদেশ। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর নিজেদের আভ্যন্তরীণ কাঠামোতে গণতন্ত্রের লেশমাত্র নেই, কখনো ছিল না। তার পরও এরা জনগণকে গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখায়। জনগন বিশ্বাসও করে। বিশ্বাস করা সহজ। সন্দেহ করাতে অনেক ঝামেলা। স্বপ্নের আগাম মূল্য পরিশোধ করে জনগণ। পুরুষেরা দলে দলে মরে, নারীরা ধর্ষিত হয়, দেশের মানচিত্র বদলে যায়। কিন্ত হায়! গণতন্ত্র আসে না। কোথা থেকে আসবে? যা নেতাদের নিজেদেরই নেই তা তারা জনগনকে কোথা থেকে দেবেন, শুনি? সুতরাং যা আছে তাদের মস্তিস্কে আর স্বভাবে তাই তারা দিয়ে যান নেতানুক্রমে। পুরুষানুক্রমে জনগন পেয়ে যায় স্বেছাচার, স্বৈরাচার, গুছের লাথি-ঝাঁটা।

প্ল্যাটো ভাবতেন, রাজকুমার যদি চরিত্রবান হন হবে তার শাসক হিসেবেও তিনি সফল হবেন। কিন্তু প্ল্যাটোর শিক্ষা বৃথা গেছে। অসীম ক্ষমতার কারণে রাজাদের মস্তিস্কের নিবৃত্তি অংশ কখনও বিকশিত হতে পারে না। রাজারা সব সময় দুশ্চরিত্র ছিল। রাজকুমাররাও চরিত্রবান হয়নি। মানুষ দেখে শেখে। আলেকজান্ডার থেকে শুরু করে আজকের যুগের নেতাদের ছেলেমেয়েদের কাজকর্মের দিকে তাকিয়ে দেখুন : তারা পরস্বাপহরণ করেছে। অকারণে অন্যের উপর অত্যাচার করেছে। পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা ক্ষমতার আঠারো আনা অপব্যবহার করছে। সুতরাং একক ব্যক্তির উপর শাসনভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকার উপায় নেই। স্বৈরাচারী স্বৈরাচারীই থেকে যায়, শাসক হয় না। 'হাতে লাঠি থাকলেই পেটাতে ইছে করবে!' মহাত্মা গান্ধীর কথা। চরিত্রবান স্বৈরাচারী - এ যেন সোনার পাথরবাটি। ক্ষমতা মানুষকে চরিত্রহীন করবেই। চরিত্রহীণ স্বৈরাচারী শাসকের খেয়ালখুশীর উপর আধুনিক মানুষ নিজের ভাগ্য সঁপে দিতে পারে না।

পারে না আবার পারে। গণতন্ত্র এক ধরণের সংঘবদ্ধ স্বৈরাচার যেখানে কিছুদিন পর পর দলবদল হয়। শ্রমিক এখানে তার উপযুক্ত প্রতিনিধিকে সংসদে পাঠাতে পারে না, কারণ শ্রমিকের প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রার্থীই হতে পারে না। নির্বাচন করা আজকের যুগে কোটি কোটি টাকার খেলা, কি এদেশে, কি আমাদের দেশে। সত্যিকারের শ্রমিক কোন প্রার্থী নির্বাচনে দাঁড়াতেই পারবে না। যদিও বা কোন মতে লাঠিভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় কোন পাগলা শ্রমিক নেতা, নির্বাচনে জিতে আসতে পারবে না সে, খুন হয়ে যাবে নির্বাচনের আগে বা পরে - এটা চোখ বুজে বলে দেয়া যায়। আর ওদিকে ইসলামী রাষ্ট্র আর রামরাজ্যে নির্বাচনের ব্যাপারটাই নেই। আপনারাই বলুন, এ অবস্থায় কোনটা মানুষের বেছে নেওয়া উচিত?

১৫. শেষ ভরসা : অক্সফোর্ড গাড়ি আর বেয়ারা ঘোড়া

যে কোন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের মঙ্গল। সমাজতন্ত্র ও ধর্মীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি মানুষের মঙ্গল বয়ে আনতে পারতো তবে শত দোষ সত্বেও এ রাষ্ট্রব্যবস্থা দু'টিকে মেনে নেওয়া যেতো। ইসলাম, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র - এই তিনটি রাষ্ট্রতত্ত্বেরই প্রয়োগ হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজ ও রাষ্ট্রে। সে প্রয়োগে ভুল ছিল কি ছিল না সে প্রশ্ন করা যেতে পারে। কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞানের কোন তত্ত্বেরই সুষম বা ইংরেজীতে যাকে বলে 'টু দি পয়েন্ট' প্রয়োগ করা যায় না। ভবিষ্যতেও যদি ধর্ম ও সমাজতন্ত্রের প্রয়োগ হয় পৃথিবীতে তবে তাতে পুরোনো ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি হবে না - এটা জোর করে বলা যায় না। 'ইতিহাসের বড় শিক্ষা এটাই যে ইতিহাস থেকে মানুষ শিক্ষাগ্রহণ করে না।' মানবচরিত্রের বড় একটি বৈশিষ্ট্য এই যে মানুষ একই ভুল বার বার করে। তা যদি নাও হয় অর্থাৎ যদি ধরেও নিই যে পুরোনো ভুলের পুনরাবৃত্তি হবে না তবুও এই সম্ভাবনা থেকে যায় যে ধর্মবাদ ও সাম্যবাদের প্রয়োগে নূতন নূতন ভুল হবে। ভুল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও হয়। এসব ভুল অনেক সময় অনিচ্ছাকৃত হতে পারে কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে গণতান্ত্রিক দেশের নেতারা ইচ্ছা করেই ভুল করেন একের পর এক, কারণ মানুষের মঙ্গলের চেয়ে নিজেদের মঙ্গলকেই তারা বড় করে দেখেন।

সব প্রয়োগেই যেহেতু ভুল থাকতে পারে সেহেতু প্রয়োগের ভুলের কথা বরং ভুলেই যাই। ফলেন পরিচিয়তে। ফল দেখে চিনতে হবে গাছটি ভালো না খারাপ। গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকেরা কখনই দলে দলে সমাজতান্ত্রিক বা ইসলামী কোন রাষ্ট্রে অভিবাসন করে না। সমাজতন্ত্রের গত সত্তর বছরের ইতিহাসে সারা পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো থেকে মানুষ পালিয়ে চলে এসেছে পশ্চিমের পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে। হাজার হাজার চীনা, ভিয়েতনামী, রুশ, চেক, পোল জনগণ প্রিয় স্বদেশভূমি ত্যাগ করে গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী হয়েছে। কাগজে কলমে বর্তমান পৃথিবীর দুই ইসলামী রাষ্ট্র ইরাণ ও পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ নাগরিক বিশ্বের অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে অভিবাসন করেছে, এখনও করছে। মানুষ পালিয়ে চলে আসছে অন্যান্য মুসলিম প্রধান দেশ থেকেও যেখানে ইসলামীকরণের পাঁয়তাড়া চলছে দীর্ঘদিন ধরে। যারা পালাতে পারে, তারা বেঁচে যায়। যারা পালাতে পারে না, তারা বিভিন্নভাবে নিষ্পেষিত হয়ে মরে বেঁচে যায়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে পালিয়ে আসা বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী এই সব দেশে নিজ নিজ ধর্মীয় বিপ্লব সংঘঠিত করার স্বপ্ন দেখে এবং এই লক্ষ্যে বিবিধ কার্যক্রম চালিয়ে যায়। অভিজ্ঞতা ও স্বভাবের দ্বন্দ্বে স্বভাবেরই জয় হয় বার বার মানুষের জীবনে ও মননে!

মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল : সুখী কে? যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন : অঋণী, অপ্রবাসী, দিনান্তে শাকান্নভোজী যে মানুষ সেই প্রকৃত সুখী। প্রবাসজীবনে অনেক কষ্ট, অনেক অপমান। তাই মানুষ সহজে মাতৃভূমি ত্যাগ করতে চায় না। তবুও মানুষকে বিভিন্ন কারণে দেশ ছেড়ে চলে আসতে হয়। সে কারণ হতে পারে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক... কারণ বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে এই যে, সব ধরণের নিরাপত্তাই মানুষ কমবেশী খুঁজে পায় পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে এসে। মানুষের জন্য রাষ্ট্র। মানুষের মঙ্গল সাধনতো দূরের কথা, মানুষকে নিজের দেশ ও সমাজ ছেড়ে পালাতে বাধ্য করে ধর্মীয় ও সাম্যবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা। কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি মানুষকে কষ্ট দেয়, এমনকি রাষ্ট্রছাড়া করে তবে সেই রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে কিছু দোষ আছে - এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

গণতন্ত্র আর পুঁজিবাদ - এ দু'টি ব্যবস্থার হাজার দোষ। এর বিকল্প বের করা অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু দুঃখজনক হলেও একথা সত্যি যে বাস্তবে মানুষ এখনও তা প্রমাণ করতে পারেনি। প্রয়োগের দিক থেকে দেখলে পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র এখনও সর্বশ্রেষ্ট অর্থ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা। সমাজতন্ত্র একটি বেতো ঘোড়া। হাজার গুঁতোতেও সহজে নড়তে চায় না। পুঁজিবাদ একটি বেয়ারা ঘোড়া। বেয়ারা কিন্তু কাজের। আপনাকে চড়তে জানতে হবে আর শক্ত হাতে এর লাগাম টেনে ধরতে হবে, যেমন ধরতে জেনেছে স্ক্যান্ডিনেভিয়্যান দেশ সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্কের জনগণ।

গণতন্ত্র একটি জরাজীর্ণ অক্সফোর্ড গাড়ি। পুরোনো ফোর্ড গাড়ির সামনে কয়েকটা অক্স বা ষাঁড় জুড়ে 'অক্সফোর্ড গাড়ি' তৈরী হয়। পুরোনো গাড়ি, চলে কি চলে না। সংসদের অক্সগুলো চাইলে গাড়ি কিছুটা এগোয়। কিন্তু ষাঁড়ের মতো নির্বোধ প্রাণী কেমন করে বুঝবে কখন গাড়ি চলবে, কখন চলবে না? মাঝে মাঝেতো বেশ চলে! ড্রাইভার প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি যদি গাড়িতে চালকের আসনে বসে থাকেন তবে বেয়াড়া ষাঁড়গুলোকেই বা কে চালায়? আবার পাচন হেনে, লেজ মুছড়ে ষাঁড়গুলোকে চালাতে গেলে গাড়ির স্টিয়ারিঙই বা কে ধরবে? কঠিন অবস্থা!

এভাবে যতদিন চলে চলুক। না চলেই বা উপায় কি? এ যদি পছন্দ না হয় তো স্বাদ বদলানোর জন্য মুখে দিতে পারেন 'সইয়ের আচার' বা স্বৈরাচার। 'বেদিশা সইয়ের আচারে ঝাল খুব বেশী। কিন্তু অনেক দিনের পুরোনো রওসুনের আচার একেবারে পানসে হয়ে গিয়েছিল!...' একান্তে বসে ভাবছিলেন ভাটি অঞ্চলের এক প্রাক্তন স্বৈরাচারী : 'এর স্বাদ টক না মিষ্টি?' গভীর রাতে ইসলামাবাদ থেকে ভেসে আসছিল পারভেজ মশার রব...